পারস্য প্রতিভা

(পারস্য কবিদের জীবন ও কাব্যালোচনা)

পারস্য প্রতিভা

(পারস্য কবিদের জীবন ও কাব্যালোচনা)

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্

ভূমিকা
হাবিব আর রহমান

KOBI PROKASHANI

পারস্য প্রতিভা
মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : মে ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন
(১৯৬৪ সালে প্রকাশিত অখণ্ড সংস্করণের বানান অনুসরণ করা হয়েছে)

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৫৫০ টাকা

Parasya Prativa by Mohammad Barkatullah Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: May 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 550 Taka RS: 550 US 30 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97730-9-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

মুখবন্ধ

১৯২৪ সনে "পারস্য প্রতিভা"র প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয় তখন পদ্যানুবাদগুলির সহিত অধিকাংশ স্থলে মূল ফারসী কবিতা সংযোজিত ছিল না। ইহাতে বহু কাব্যামোদী পাঠক মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, মূল বস্তুর আস্বাদ না পাইলে শুধু অনুবাদ পড়িয়া তৃপ্তি হয় না। তাই, পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সে ত্রুটি দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে এবারেও কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হইয়াছে। সাময়িক পত্রিকায় মাঝে মাঝে যে সকল নূতন তথ্য প্রকাশিত হয় সেইগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বইখানিকে যথাসম্ভব আধুনিক (up to date) করার চেষ্টা করিয়াছি। তাহা ছাড়া কবিদের আবির্ভাব কালের ক্রম বিবেচনা করিয়া এবার কবি হাফিযকে দ্বিতীয় খণ্ডে এবং নাসির খসরূকে প্রথম খণ্ডে স্থান দিয়াছি। উভয় খণ্ড একত্রে প্রকাশের আশায় দ্বিতীয় খণ্ডের সমগ্র ভূমিকা প্রথম খণ্ডে আনিয়াছি। ইহাতে গ্রন্থের ভূমিকা একশত পৃষ্ঠা ছাড়াইয়া গিয়াছে। পারস্য সাহিত্য সম্পর্কে যা-কিছু জ্ঞাতব্য সমস্তই এই ভূমিকার ভিতর পরিবেশনের প্রয়াস পাইয়াছি।

দুঃখের বিষয় এদেশে ফারসী সাহিত্যের চর্চা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। যে ভাষার অমৃত-নিঃস্বন ও মাধুরী আজ পর্যন্ত বিশ্বের দরবারে মর্যাদা হারায় নাই, যার কবি-সাধকদের গভীর আধ্যাত্মিকতা এখনও জড়বাদ-আশ্রয়ী পাশ্চাত্য জগৎকে সম্মোহিত রাখিয়াছে, যে ভাষায় পাক-ভারতের মনীষীদের দীর্ঘ সাতশত বৎসরের জ্ঞানচর্চা নিবদ্ধ রহিয়াছে, সেই অমূল্য ভাণ্ডারের সম্পদরাশি হইতে পাকিস্তানী তরুণেরা আজ বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। কালে হয়ত এমন দিনও আসিতে পারে যখন বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট ফিরদৌসী, হাফিয, সা'দী, রুমী এবং ওমর খইয়াম প্রমুখ অমর কবিগণের স্মৃতি, হোমার, গ্যেটে প্রভৃতি বৈদেশিক কবিদের মতোই শুধু নামে মাত্র পর্যবসিত হইবে। "পারস্য প্রতিভা" বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তেমন দিনে পারস্যের মহাকবিগণের পরিচয় জানার পক্ষে রস-পিপাসু বঙ্গভাষা-ভাষী পাঠকদের কিঞ্চিৎ কাজে লাগিতে পারে, এই ভরসায়ই এই গ্রন্থের উভয় খণ্ড পুনরায় প্রকাশ করিতেছি।

পারস্য প্রতিভার প্রবন্ধগুলি ইংরাজী ১৯১৮ হইতে ১৯২২ সনের ভিতর লিখিত ও বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তৎকালে কবি ও কাব্য সম্বন্ধে

আলোচনামূলক কোনও পুস্তক বাংলা সাহিত্যে ছিল না। ইংরেজীতেও সকল তথ্যের একত্রে সমাবেশ কোনও একখানি পুস্তকে দৃষ্ট হয় নাই। ঐ সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় চারিবৎসর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গবেষণার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। তারই ফলে এই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ রচিত হয়। তারপরও এ যাবৎ যেখানে যত নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। সুদীর্ঘ অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের এই অকিঞ্চিৎকর ফল "পারস্য প্রতিভা" যদি দেশের তরুণ সমাজের কিঞ্চিৎ উপকারে আইসে, বিশেস করিয়া যাহারা পারস্যের নবরত্ন অর্থাৎ নয়জন শ্রেষ্ঠকবি—যাহাদিগকে পারস্য সাহিত্যের দিকপাল বলা হয়—তাঁহাদের জীবন ও রচনা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু, তাঁহাদের কতকটা সময় ও শ্রমের সংক্ষেপ ইহা দ্বারা হয়, তবেই আমার কষ্ট স্বীকার সার্থক বিবেচিত হইবে।

প্রকাশ থাকে যে এবারও পারস্যের দুইজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-লেখক ইবনে সিনা ও আল গায্যালীর জীবনী ও গ্রন্থ-পরিচিতি নূতন সংযোজিত হইল।

বর্তমানে কাগজের মূল্য ও ছাপাখানার খরচ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পুস্তকের কলেবর পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া যাওয়ায় সামান্য কিছু মূল্য বাড়াইতে বাধ্য হইলাম। পুস্তকখানি নির্ভুল করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করিয়াও ছাপার ভুলের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারি নাই। এজন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। ইতি, ভাদ্র, ১৩৭২ সন।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্

সূচিপত্র

বর্তমান প্রকাশের ভূমিকা [৯-২৪]

ভূমিকা [২৭-১৯৩]

কবি ফির্দৌসী ১০৬
ওমর খইয়াম ১৩৫
শেঁখ সা'দী ১৬৪
নাসির খসরূ ১৮২

পারস্যের সাধক কবিগণ [১৯৫-২৮২

নেযামী ১৯৭
ফরিদউদ্দীন আত্তার ২০৮
মৌলানা রুমী ২২৩
কবি হাফিয ২৪৮
মোল্লা জা'মী ২৬৯

পারস্যের দার্শনিক লেখকগণ [২৮৩-৩১৮]

ইব্‌নে সিনা ২৮৫
আল্‌ গায্‌যালী ৩০০

পরিশিষ্ট [৩১৯-৩২৭]

বর্তমান প্রকাশের ভূমিকা

আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪) একটি বিশিষ্ট নাম। সৃষ্টিধর্মী রসসাহিত্যের বিচারে যাঁদের আমরা সাহিত্যিক বলি তিনি সে অর্থে সাহিত্যিক ছিলেন না। লেখক-জীবনে তাঁর মনোযোগের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ইসলামের আদি যুগের ইতিহাস, ফারসি সাহিত্য ও দর্শন। এছাড়া স্বতন্ত্র কিছু প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন। তাই লেখক হিসেবে তাঁর মূল পরিচয় একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসাবে।

বরকতুল্লাহর দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ 'মানুষের ধর্ম' বাদে অন্য প্রায় সমস্ত রচনার বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে তাঁর মূল মানস-বৈশিষ্ট্যটি সহজে বোঝা যায়। তিনি ছিলেন মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একজন অনুরাগী পাঠক ও রূপকার। তাঁর রচনাবলিতে এ পরিচয়টিই সবচেয়ে বেশি প্রস্ফুট। ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর জীবন ও কৃতি নিয়ে 'নবীগৃহ সংবাদ' ও 'নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ' নামে দুটি দীর্ঘকলেবর গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। এছাড়া লিখেছিলেন হযরত ওসমানের জীবনী 'হযরত ওসমান' ও কারবালার ইতিহাসসম্মত কাহিনি 'কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত'। তাঁর বহুবিখ্যাত 'পারস্য প্রতিভা'ও মুসলিম পারস্যের জগদ্বিখ্যাত কতিপয় কবি-লেখক-সাধকের কৃতি ও জীবনকাহিনী। এমনকি তাঁর স্বতন্ত্র প্রবন্ধগুলোতে সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটলেও সেগুলোরও কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে মুসলিম সমাজ। এদিক থেকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করলে বরকতুল্লাহকে বিগত শতাব্দীর 'সুধাকর দল'-এর একজন মননশীল উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ইংরেজ আমলে হতচেতন ও অধঃপতিত বাঙালি মুসলিম সমাজকে ইসলাম ধর্মের সুমহান বাণী ও গৌরবকাহিনি শুনিয়ে তাদের আত্মসচেতন ও ইসলামমুখী করে তোলার জন্য উনিশ শতকের শেষ দিকে কয়েকজন মুসলিম লেখক কলকাতায় সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। 'সুধাকর' (১৮৮৯) নামক পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন বলে কেউ কেউ এঁদের 'সুধাকর দল' নামে অভিহিত করেছেন। প্রধানত এঁদের দ্বারাই বাংলা গদ্যে ইসলামের ধর্ম, ইতিহাস, জীবনী, গৌরবগাথা ইত্যাদি কীর্তিত হতে থাকে। খ্রিস্টান পাদরিদের আক্রমণ থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করাও সেদিন তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই

সুধাকর দলের প্রদর্শিত পথে পরবর্তীকালে অনেক মুসলিম লেখক পদচারণা করেছেন এবং তাঁদের কিছু কিছু রচনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ মূলত এই ধারারই লেখক। একজন সমালোচক তাঁর এ দিকটি সম্পর্কে লিখেছেন :

> এ যুগের আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বাঙালি মুসলমানের কাছে বরকতুল্লাহ্ একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের বাণী নিয়ে উপস্থিত। তাঁর সাহিত্য সাধনা মুসলমানের জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হতে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি তাদের চিন্তার দিগন্ত প্রসারণের পথের ইঙ্গিত দিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে বহমান এই মুসলিম ধারাটিতে বরকতুল্লাহর ছিল একটি সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তিনি এর মধ্যে এনেছিলেন মননশীলতার দীপ্তি। আসলে রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩), বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৫), কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০), প্রমথ চৌধুরী (১৮৭৩-১৯৪৯), এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) প্রমুখের মধ্য দিয়ে মনীষার যে-ধারাটি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে তিনি সেই ধারারই যোগ্য অনুসারী ছিলেন। মেধাবী বরকতুল্লাহ্ দর্শন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। কর্মজীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করতেন। এভাবে তিনি এক বিপুল মানব-সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। উত্তরসূরিদের জন্য সেই সম্পদ তিনি দান করে গেছেন তাঁর রচনার মাধ্যমে।

বরকতুল্লাহর মনীষা শুধু জ্ঞানচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি একজন উচ্চশ্রেণির ভাষাশিল্পীও ছিলেন। 'পারস্য প্রতিভা' ও 'মানুষের ধর্ম'-এ তিনি ধ্বনিসম্পদে ভরপুর যে কবিত্বময় গদ্য লিখেছিলেন তা যেকোনো পাঠককে আকৃষ্ট না করে পারে না। অবশ্য সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে যে-প্রত্যাশা তিনি জাগিয়েছিলেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেষ পর্বে তা সম্পূর্ণ বজায় রাখতে পারেননি। তবু এ সত্য স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বাঙালি মুসলমানের জীবনের জ্ঞানচর্চা, মনন ও ভাবনার ক্ষেত্রে বিরাজমান দৈন্য মোচনে যে-অক্লান্ত সাধনা তিনি করেছিলেন তার তুলনা বড় বেশি মেলে না।

দুই

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ বর্তমান বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত ঘোড়শাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৮ সালের ২রা মার্চ। বাংলার অসংখ্য গ্রামের মতো এটিও সে-সময় ছিল একটি অজ পাড়াগাঁ। কিন্তু তাহলেও বরকতুল্লাহর পিতা হাজি আজম আলী ছিলেন একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, পেশায় কবিরাজ। ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। হাজি আজম আলী পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বরকতুল্লাহর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোহম্মদ রহমতুল্লাহ লেখাপড়া শেষ করে গ্রামে এলোপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। অবসর সময়ে তিনি কিছু কিছু সাহিত্যচর্চা করতেন বলে জানা যায়।

শৈশব থেকেই বরকতুল্লাহর মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম বেলতৈল মিডল ইংলিশ স্কুল থেকে তিনি নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও এম. ই. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। ১৯০৯ সালের এম. ই. পরীক্ষায় রাজশাহী বিভাগে বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় তিনি বিভাগীয় ইন্সপেক্টর কর্তৃক পুরস্কৃত হন।

১৯১০ সালে বরকতুল্লাহ শাহজাদপুর হাইস্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯১৪ সালে সেখান থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন। তারপর ভর্তি হন রাজশাহী কলেজে। ১৯১৬ সালে সেখান থেকে এফ. এ. পাস করেন প্রথম বিভাগে। এবারও লাভ করেন বিভাগীয় বৃত্তি। একই কলেজ থেকে ১৯১৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে দর্শনে অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন।

বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর বরকতুল্লাহ সাংসারিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েন। একমাত্র অভিভাবক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকাল মৃত্যু ঘটে। পিতার মৃত্যু হয়েছিল আগেই। ফলে পড়াশোনা চালানো সম্ভব হবে না ভেবে বাড়ির কাছে একটি নতুন হাইস্কুলে হেডমাস্টারি নিয়েছিলেন এবং ঠিক করেছিলেন সেখানেই থেকে যাবেন। কিন্তু বিদ্যোৎসাহী শ্বশুর ও ভগ্নীপতির সহযোগিতায় ১৯১৮ সালেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে এম.এ. শ্রেণিতে ভর্তি হন। তখনকার অনেক ছাত্রের মতো বরকতুল্লাহও এম.এ. পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইন পড়তে থাকেন। ১৯২০ সালে দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ স্থান পেয়ে তিনি এম.এ. পাস করেন। তাঁর বরাবরের ইচ্ছা ছিল শিক্ষকতা করার। কিন্তু সে-সুযোগ তিনি পাননি। ১৯২২ সালে আইন পাস করে তাই পাবনা জজ কোর্টে ওকালতির উদ্দেশ্যে সনদ গ্রহণ করেন।

সরকারের সিভিল সার্ভিস পদে লোক নিয়োগের জন্য ১৯২২ সালে প্রথম বি.সি.এস. (বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। এর আগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হতো নমিনেশনের দ্বারা। ১৯২১ সালে বরকতুল্লাহ রাজশাহী বিভাগ থেকে ডেপুটি পদের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং ইন্টারভিউতে প্রথম নমিনেশন পেয়েছিলেন। কিন্তু তদবিরের জোরে চাকরি পেয়েছিলেন দ্বিতীয় নমিনেশন পাওয়া ব্যক্তি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় বরকতুল্লাহ এবার নিজের যোগ্যতার স্বীকৃতি পেলেন। প্রথম বি.সি.এস. পরীক্ষায় অংশ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর বরাবরের ইচ্ছা ছিল অধ্যাপনা করার। ডেপুটির চাকরি তাঁর মনঃপুত ছিল না। তবু সংসারের চাপে শেষ পর্যন্ত সেই চাকরিই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। ১৯২৩ সালের মে মাসে বরকতুল্লাহ ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। সেই থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত বাংলা প্রদেশের নানা স্থানে সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করেন। ১৯২৪-এ দায়িত্ব পান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের। এ পদে ছিলেন

শ্রীরামপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। পরে সাবডিভিশনাল অফিসার হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন জামালপুর, বহরমপুর ও বাগেরহাটে। মাঝখানে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ সমবায় ও ঋণসালিশী বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে প্রায় পাঁচ বছর কর্মরত ছিলেন। পরে কিছুকাল সিভিল সাপ্লাই বিভাগে কাজ করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বরকতুল্লাহ্ ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নিযুক্ত হন। পরে জেলা প্রশাসক হিসেবে বদলি হন কুষ্টিয়ায়। তারপর আবারও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, এবার ময়মনসিংহে। পরে আবার জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পান বরিশাল জেলার। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে জেলা প্রশাসন থেকে তাঁকে নিযুক্ত করা হয় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারি হিসেবে। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে এই পদ থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

আমলা হিসেবে বরকতুল্লাহর দায়িত্বের অবসান ঘটলেও বিদ্বান, বিজ্ঞ ও লেখক বরকতুল্লাহর দায়িত্ব দেশের কাছ থেকে তখনও শেষ হয়নি। ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁকে বিশেষ কর্মকর্তার (বর্তমানে মহাপরিচালক) দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তার আগেই ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার অন্তর্ভূত বাংলা ভাষার গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার ষোড়শ দফাটি কার্যকর করার উদ্যোগ যখন নেওয়া হয় তখন তাঁকেই তার পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হয়। বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করার জন্য যে-বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম সদস্য।

১৯৫৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির বিশেষ কর্মকর্তার দায়িত্ব থেকে বরকতুল্লাহ অব্যাহতি পান। কিন্তু তাহলেও একাডেমির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রায় আমৃত্যু বজায় ছিল। ১৯৫৭-র আগস্টে সরকার কর্তৃক বাংলা একাডেমির আয়োজক সমিতিকে একাডেমির কাউন্সিলের মর্যাদা দান করা হলে বরকতুল্লাহ তাঁর সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮-তে গঠিত একাডেমির প্রথম নির্বাচিত পরিষদের একটি শূন্য পদের উপনির্বাচনে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬২-৬৩ সালে মনোনীত হয়েছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি পদে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদান ও কর্মজীবনে কৃতিত্বের জন্য মোহম্মদ বরকতুল্লাহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তিত হলে প্রথম বছরেই তিনি প্রবন্ধের জন্য উক্ত পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তাঁকে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব ও স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। 'নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ' গ্রন্থের জন্য ১৯৬৩-তে পান দাউদ সাহিত্য পুরস্কার। ১৯৭০-এ পান পাকিস্তান সরকারের President's medal for pride of performance পুরস্কার। ১৯৮৪-তে তাঁকে দেওয়া হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (মরণোত্তর)।

১৯৭৪ সালে ২ নভেম্বর ৭৬ বছর বয়সে বরকতুল্লাহ পরলোকগমন করেন।

তিন

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর সাহিত্যিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মূলত তাঁর ‘পারস্য প্রতিভা’ ও ‘মানুষের ধর্ম’ গ্রন্থদুটির ওপর। এর মধ্যে বিষয়গত কারণে ‘পারস্য প্রতিভা’র পরিচিতি ব্যাপকতর। বস্তুত বরকতুল্লাহ আর ‘পারস্য প্রতিভা’ একরকম সমার্থক হয়ে আছে। লেখকের মনীষা, রসজ্ঞান ও উঁচু স্তরের শিল্পচেতনার স্বাক্ষর ধারণ করে আছে এই গ্রন্থ। যেকোনো বিচারে বাংলা সাহিত্যের এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। এমন বহু-কীর্তিত গদ্যগ্রন্থ বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্তও বিরল বলা চলে। পারস্যের কাব্যকুঞ্জে একদিন যেসব বিরল প্রতিভার পুষ্পসৌরভ দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তার আঘ্রাণ বাংলা ভাষায় আমরা পাই এই গ্রন্থ থেকে। বরকতুল্লাহর মৃত্যুর পর ‘দি ডেইলি বাংলাদেশ অবজারভার’ তাঁদের সম্পাদকীয়তে ‘পারস্য প্রতিভা’কে যে 'a monument in Bengali writing of deep insight and imaginative study' বলে মন্তব্য করেছিলেন তা মোটেও অযথার্থ নয়। এটি প্রকাশের পর যেসব পত্রিকায় আলোচনা হয়েছিল তাতে সকলেই এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

‘পারস্য প্রতিভা’র বাতায়ন পথে পারস্যের গৌরব যুগের প্রতিভাদীপ্ত কবি ও দার্শনিক লেখকদের যে-মহিমাব্যঞ্জক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় তা আমাদের পারস্য-সংস্কৃতির সঙ্গে শুধু সেতুবন্ধন ঘটায় না, একটি হারানো যোগসূত্রের স্মৃতি এনে দেয়। সেই স্মৃতি পথে আমরা দেখতে পাই পারস্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। আর্যসভ্যতার উন্মেষকাল থেকে পারস্যের সাথে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই যোগ সুদৃঢ় ও ব্যাপক ভিত্তি পায় ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন ও ইসলামের প্রভাব বিস্তৃতির মাধ্যমে। দেশের রাজভাষা হয় ফারসি। লক্ষণীয় যে এই প্রভাব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের ওপর পড়েনি, একই সঙ্গে তা হিন্দু-মানসকেও প্রভাবিত করে। নির্বিশেষ হিন্দু-মুসলমান-মানসে পারস্য-সংস্কৃতির এই প্রভাব ক্রমশ ছিন্ন হতে থাকে ব্রিটিশ শাসনামলে এসে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে ফারসির স্থান দখল করতে থাকে ইংরেজি ভাষা। তারপর ১৮৩৭ সালে ফারসির বদলে রাজভাষার মর্যাদা পায় ইংরেজি। ফলে বৈষয়িক জীবনে ফারসির গুরুত্ব প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু ভারতীয় তথা বাঙালি-মানসে এই প্রভাব এত দৃঢ়মূল ছিল যে, তাকে একেবারে উৎখাত করা সম্ভব হয়নি। কেননা ফারসি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি একদিকে এদেশের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে যেমন সমৃদ্ধ করেছিল তেমনি অন্যদিকে এই ভাষাচর্চার পথ ধরে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সমঝোতা সৃষ্টির পথ তৈরি হয়েছিল।

হিন্দু-মুসলমান-মানসের এই সমঝোতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উত্তরাধিকার দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মসাৎ করে মধ্যযুগের বাঙালি তার নিজের ভাষা-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে

তৎপর হয়ে উঠেছিল। ফারসি ভাষা থেকে অকৃপণভাবে শব্দ গ্রহণ ও আত্মীকরণ করে বাংলা ভাষা যেমন নতুন সাজে সজ্জিত হচ্ছিল, তেমনি ফারসি ভাববস্তু গ্রহণ করে বাংলা সাহিত্যও রূপে-রসে অভিনবত্ব লাভ করছিল। এটি হিন্দুর, ওটি মুসলমানের এই ভেদচিন্তা সেদিনকার বাঙালি লেখকদের মোটেও দ্বিধাগ্রস্ত করেনি। তাই ফারসি না শেখার জন্য অভিভাবকদের কাছে একদা নিন্দাবাক্য শুনতে হয়েছিল যে-ব্রাহ্মণ হিন্দু সন্তানকে, সেই ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর পরবর্তী কালে লিখেছিলেন : 'না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল/অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।' শুধু বাংলা ভাষায় নয়, ফারসি ভাষায়ও অনেক হিন্দু-মুসলমান লেখক পারস্যপ্রভাবিত সাহিত্য রচনা করেছিলেন।

এভাবে ফারসি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা ও তৎপ্রভাবিত বাংলা সাহিত্য রচনা ও অনুবাদের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে-সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল তাতে প্রথম আঘাত হানে কূটকৌশলী ইংরেজ। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি হতে থাকে। ফারসি তার নিজস্ব মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর এই ব্যবধান আরও বেড়ে যায়। ড. নজরুল ইসলাম 'বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে জানিয়েছেন যে, বাঙালি হিন্দুরা ইংরেজি ভাষা শিখে ফারসির বদলে ইংরেজিকে অফিস-আদালতের ভাষা করার দাবি তুলেছিল। সে-মোতাবেক ১৮৩৭ সালে ইংরেজি রাজভাষা হয়। এর ফলে সরকারি চাকরির সিংহভাগ দখল করে হিন্দুরা। এরপর ছিল ব্রিটিশের 'ভাগ করো ও শাসন করো' নীতি। ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ব্যবধান দুস্তর হয়ে ওঠে।

প্রতিবেশী কিন্তু শত্রু—এই দুর্বিসহ অবস্থার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন ছিল ভাবচিন্তার এমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যেখানে হিন্দু-মুসলমান জিঘাংসাবৃত্তি ত্যাগ করে পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতার হাত প্রসারিত করতে পারে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বাংলায় যে-নবজাগরণ প্রচেষ্টা শুরু হয় তা ছিল একদিকে হিন্দু জাগরণ আর অন্যদিকে মুসলিম জাগরণ। ফলে কবি নজরুলের ভাষায় 'টিকি' আর 'টুপি'তে বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় আমরা কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে লুপ্তপ্রায় পারস্যচর্চার পথ ধরে বাংলার লেখক সমাজের, ক্ষুদ্র হলেও, একটি অংশ আগের মতো পরস্পর আত্মীয় হয়ে উঠতে চেয়েছেন। সাহিত্যের যুগধর্মকে অস্বীকার করে নয়, বরং তার পূর্ণ স্বীকৃতির মাধ্যমেই সে-কাজ তারা শুরু করেছিলেন।

ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন নবজাগরণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ কালের পারস্য চর্চায় সেই চেতনার সাক্ষাৎ মেলে। এ থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, প্যারস্যের ভাষা-সাহিত্য এদেশের ঐতিহ্যরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। সেই ঐতিহ্যের অংশীদার ছিল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-

১৯৫২), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১) প্রমুখের সাধনায় আমরা তারই প্রমাণ পাই। পারস্যের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের নাড়ীর টান এমনিভাবে নতুন করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিশেষ পটভূমিতেই রচিত হয় বরকতুল্লাহর 'পারস্য প্রতিভা'।

চার

বরকতুল্লাহ তরুণ বয়স থেকেই ফারসি ধ্রুপদী কবিতার আনন্দলোকে বাস করতেন। এর প্রমাণ মেলে রাজশাহী কলেজে বি.এ. পড়ার সময়েই কবি ফেরদৌসী ও হাফিজ সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনার ঘটনা থেকে। স্কুলেই তিনি ফারসি পড়েছিলেন। তখন পারস্যের ভুবনবিখ্যাত কবিকুলের নাম শুনে থাকলেও তাঁদের সঙ্গে গভীর পরিচয় হওয়ার কথা নয়। সেই পরিচয় ঘটল বি.এ. পড়ার সময়। বি.এ-তে তাঁর অন্যতম পাঠ্য বিষয় ছিল ফারসি। তরুণ বরকতুল্লাহ লক্ষ করেছিলেন প্রায় শতাব্দীকাল আগে ফারসি ভাষা এদেশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা হারানোর ফলে মুসলিম-পারস্যের ধ্রুপদী সাহিত্যের অমূল্য রত্নরাজির সঙ্গে বাঙালি পাঠকের, বিশেষত বাঙালি মুসলমানের পরিচয় নেই বললেই চলে। অথচ এ ঐতিহ্যের তারাও তো অংশীদার। কিন্তু কোনো মুসলিম লেখক বাংলা ভাষায় এই সাহিত্যসম্পদের সঙ্গে তাঁর স্বভাষী পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার আগ্রহ তেমন বোধ করেছিলেন বলে মনে হয় না। মুহম্মদ আকমলের শেখ সাদীর 'পান্দনামা' অনুবাদ (১৮৬৩), মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) 'ফেরদৌসী চরিত' আলোচনা (১৮৯৮) ও 'শাহনামা' কাব্যের প্রথমাংশের অনুবাদ 'শাহনামা ১ম খণ্ড' (১৯০৯), শেখ মুহম্মদ আবদুল কাদিরের 'গুলিস্তা' (১৯০৫) ও 'নীতিকানন' নামে 'বুস্তা'র অষ্টম অধ্যায়ের গদ্যানুবাদ (১৯১৮), মুনসী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহর (১৮৬১-১৯০৭) কিছু ফারসি নীতি কবিতার অনুবাদ 'পান্দেনামা' (দ্বি-স ১৯০৮) ইত্যাদি রচনাকর্মকে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা যেতে পারে। ইংরেজি শিক্ষিত নবলব্ধ চেতনার অধিকারী যেসব মুসলমান লেখক বাংলা ভাষার মাধ্যমে পারস্য চর্চার হারানো পথের সন্ধানে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সবারই—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬২), কাজী আকরাম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬৩), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৪) প্রমুখের ফারসি রচনাসমূহের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বরকতুল্লাহর 'পারস্য প্রতিভা' প্রকাশের (১ম খণ্ড ১৯২৪, ২য় খণ্ড ১৯৩২) অব্যবহিত সমকালে অথবা তার পরে।

দেখা যায় ফারসি সাহিত্যের সঙ্গে ফারসি-না-জানা বাঙালি পাঠকের যেটুকু ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটতে পেরেছিল তা সম্ভব হয়েছিল মূলত হিন্দু লেখকদের প্রচেষ্টার দ্বারা। গিরিশচন্দ্র সেনের (১৮৩৫-১৯১০) দিওয়ান-ই-হাফিজ, সাদীর গুলিস্তা,

বুস্তাঁ, মসনভ-ই-রুমী প্রভৃতি গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১৮৩৪-১৯০৭) দিওয়ান-ই-হাফিজের ভাবাবলম্বনে রচিত 'সদ্ভাব শতক' (১৮৬১), বিনোদবিহারী মুখার্জির 'ওমর গীতি' (১৯১৪), সুরেন রায়ের 'ওমর প্রসাদ' (১৯১৯), কান্তিচন্দ্র ঘোষের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' (১৯২১) বিজয় কৃষ্ণ ঘোষের ওমর খৈয়ামের অনুবাদ (১৯২২), সুরেশ চন্দ্র নন্দীর শেখ সাদীর জীবন-সময়-কাব্যকৃতি নিয়ে আলোচনা পুস্তিকা 'কবি শেখ সাদী' (১৯২৩) প্রভৃতি রচনার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বরকতুল্লাহর 'পারস্য প্রতিভা' প্রকাশের সময়েও বেশ কয়েকজন হিন্দু লেখক খৈয়াম ও হাফিজের অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়া মোহিতলাল মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পারস্য বিষয়ক মৌলিক ও অনূদিত বিচ্ছিন্ন কবিতাবলির কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ফারসি সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপক পরিচয়দানে নিজের সম্প্রদায়ের লেখকদের কিছুটা অনাগ্রহ লক্ষ করে বরকতুল্লাহ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিলেন বলে মনে হয়। গোলাম সাকলায়েনের সঙ্গে একবার আলাপকালে এই ক্ষোভ তিনি প্রকাশ করেন। গোলাম সাকলায়েন লিখেছেন,

> সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মুসলমানের অনগ্রসরতার জন্য তাঁর মনে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তাই তিনি মনে করতেন, যদি মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কালীপ্রসন্ন ঘোষের মতো ভাষা ও বর্ণবিন্যাসের সাহায্যে উপস্থাপন করা যায়, তবে তা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের কাছে গ্রাহ্য হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়ার পর বরকতুল্লাহ তাঁর মনোবাঞ্ছা সফল করার সুযোগ পান। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'মোসলেম ভারত', 'সওগাত' প্রভৃতি মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকায় ছিল লেখা দেওয়ার তাগিদ, আর সেই তাগিদ সম্পাদনে সহায়তা করেছিল ইমপিরিয়াল লাইব্রেরি (বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরি)। বরকতুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, পারস্যের কবিদের জীবনী ও কাব্যালোচনা লিখতে তাঁকে চার বছর নিয়মিত এই লাইব্রেরিতে গবেষণা চালাতে হয়েছিল। সে-গবেষণার ফল অংশত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'পারস্য প্রতিভা' (প্রথম খণ্ড) নামে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ছটি প্রবন্ধ—১. পারস্য সাহিত্য ২. কবি ফির্দৌসী ৩. ওমর খইয়াম ৪. শেখ সাদী ৫. কবি হাফিজ ও ৬. জালালুদ্দীন রুমী। আর এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩২ সালে। এ খণ্ডে ছিল সাতটি প্রবন্ধ—১. পারস্যের উর্বর যুগ ২. ফরিদ উদ্দীন আত্তার ৩. নাসির খসরু ও ইসমাইলী মত ৪. নেজামী ৫. জামী ৬. সুফীমত ও বেদান্ত এবং ৭. সুফীমত ও নিওপ্লেটোনিজম।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ যা চেয়েছিলেন তা সফল হলো। বাঙালি পাঠক এক অনবদ্য ভাষার মাধ্যমে জানতে পারলেন আধুনিক ফারসি সাহিত্যের দিকপাল কবি ও দার্শনিক লেখকদের সম্পর্কে। বাংলা সাহিত্যে এ তাঁর এক অবিস্মরণীয় অবদান। মুহম্মদ আবদুল হাই যথার্থই লিখেছেন :